দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

দায়িত্ব পালনের বাধা দূর করুন

ড. মুহম্মদ মাহবুব আলী

দেশে শিক্ষা জগতের প্রসারে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার একের পর এক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তাঁর বিশেষ উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে ড্রপ আউট প্রায় শূন্যের কোঠায়। মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেতে হলে ইকোনমিক ভার্নাবেলিটির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এদিকে নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে অনেক স্কুলে মেয়ে শিশুর সংখ্যা ছেলে শিশুর চেয়ে বেশি– যা সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন। সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০। একটি অসম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষা প্রসারে সরকারের শুভ উদ্যোগ ছিল। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে এটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন কারণে ধীরলয়ে হচ্ছে– যা আসলে দ্রুতগতিতে হলে ভাল হতো। গত আট বছরে সরকার অর্থনীতি, সামাজিক অগ্রগতি, সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা ও সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সূচকের ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে– এখানেই জননেত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দর্শনের বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এক অনন্য নজির হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। হেফাজত বিএনপি-জামায়াতের মতো একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র।

বঙ্গবন্ধু সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন এবং উন্মুক্ত করেছিলেন সীমিত সংখ্যক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের অর্গল। গত আট বছরে তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়– সর্বত্র শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। এটি একটি বিস্ময়কর সাফল্য। যে কোন সাফল্য ঘটলে তার মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেটি দলীয় সমর্থক হলেও নির্মোহ ভঙ্গিতে যদি একজন শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি করেন তবে সেটি অনেকখানি গ্রহণযোগ্য হয়, যা আমার ধারণা। কেননা আমি বিশ্বাস করি– যখন কেউ কাজ করেন তখন তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনাগত কারণে বিভিন্ন জনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ নির্ভরশীলতা অবশ্যই বাস্তবায়নগত কারণে। কিন্তু যারা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মধ্যে অনেক সময় ছদ্মবেশীরা থাকেন– যারা গিরগিটির মতো রং বদলান। আসলে নিয়ম হচ্ছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বৃহত্তর আদলে জনকল্যাণের রূপরেখা দেবেন– সে রূপরেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ কাজ করবেন– এখানে সমাজবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষাবিদ, সরকারী-বেসরকারী আমলা, প্রশাসনযন্ত্র, মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়, সাংবাদিক, গণমাধ্যম কর্মী, আইনজীবী সবাই স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে কাজ করবেন। মাঝে মাঝে আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ। ফলে অগ্রগতির ক্ষেত্রেও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে যায়– সেগুলোকে P-D-C-A-এর আওতায় ঠিক করা জরুরী হয়ে পড়ে অর্থাৎ Plan-Do-Check-Act। সেজন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুষ্ঠু সুযোগ দেয়া উচিত।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন হলে দেশে একটি একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠত। অথচ বৈপরীত্যের ঘনঘটা ঘটে অন্যখানে। তখনও হেফাজত দৃশ্যমান হয়নি। হঠাৎ করে পঞ্চম ও অষ্টম উভয় শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষার আয়োজন করা হলো। কিন্তু জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী অন্তত পঞ্চম শ্রেণীতে পাবলিক পরীক্ষা হওয়া উচিত ছিল না। যেহেতু বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ সেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভৌত অবকাঠামো ভাল তা কিন্তু নয়। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যাদের অবস্থা অবশ্য কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও অনেক মজবুত। তারপরও সরকারী ওই বিদ্যালয়গুলোর মান উন্নত নয়। কেননা কেবল ভৌত অবকাঠামো থাকলেই হবে না– চাই গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষক ও অভিভাবকদের সদিচ্ছা। আসলে একশ্রেণীর শিক্ষাবিদ যারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করেন, তাদের ফাঁকি দেয়ার কারণে অভিভাবক-অভিভাবিকারা ওইসব স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠান না। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধিটি দূর করতে হলে অবশ্যই প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জাতীয় দায়িত্বের নাম করে বিভিন্ন কাজে লাগায়। যেখানে জননেত্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন, মান-মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন ও শূন্যপদ পূরণের সকল ধরনের ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। দুর্ভাগ্যজনক যে, শূন্যপদ পূরণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দেখা দিচ্ছে। মনে পড়ে একজন সাবেক সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং পাওয়ার পর একটি সেমিনারে দু'বছর আগে বলেছিলেন, 'আমাদের নিজস্ব কাজ আছে। তার ওপর অন্য আরেকটি মন্ত্রণালয়ের খবরদারির কারণে কোন কিছু করা সম্ভব হয় না। সরকারী চাকরি করি বলে এ মন্ত্রণালয়ে পদায়ন পেয়েছি। যদি এখানে থাকি তবে চেষ্টা করব কিছু একটা করার।' বাস্তবতা হলো– তিন মাসের মধ্যেই উনার ভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং হয়ে যায়। আর উনার কিছু একটা করা হয়ে ওঠেনি। আসলে বাস্তবতা ও ইচ্ছাবোধ অনেক সময় বিপরীত হয়ে যায়।

আমরা যদি বড় দাগে দেখাতে যাই তবে শিক্ষার ৪টি স্তর হচ্ছে– প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে– মন্ত্রী ও সচিব রয়েছেন। কিন্তু তারা কি যথাযথভাবে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন? কেননা ইদানীং প্রাথমিক যদি ধরে নেই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত; বাংলা, বিজ্ঞান, অংক, ইংরেজী, ইসলামিয়াতসহ বিভিন্ন বইয়ে যে নামী পন্ডিতগণ বই রচনা করেছেন এবং তাদের সঙ্গে একাত্তর ও পঁচাত্তরের নারকীয় ঘটনার প্রেতাত্মা এবং কোচিং ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে এমন ধরনের বই তারা রচনা করেছেন যেখানে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলা বই গুরুচন্ডালী দোষে দুষ্ট, বানান ভুল, এমনকি চিত্রসমূহ যাচ্ছেতাই। আবার অসাম্প্রদায়িকতা আর মুক্তিযুদ্ধ চেতনা ও সর্বোপরি জাতির পিতাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। ইসলামিয়াত বইতে কিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল কথা বলা হয়েছে। আর বিজ্ঞান ও অংক বই পুরোপুরি কোচিং ও গৃহশিক্ষকনির্ভর করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে প্রতিকার পেতে অবশ্যই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ওপর বইয়ের বোঝা কমাতে হবে। ছয় বছরের বাচ্চা কি পড়বে আর পনেরো বছরের বাচ্চা কি পড়বে দুটোর পার্থক্য যখন সম্মানিত শিক্ষাবিদরা ভুলে যান– তখন সন্দেহ জাগে এরা কি স্যাবোটেজ করছেন? জননেত্রীর আদর্শের প্রতি কি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন? মোশতাক-জিয়া কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি ছিলেন। শিক্ষাবিদদের মধ্যেও নানা মানসিকতার লোক থাকতে পারে। তাদের এভাবে ব্লাঙ্ক চেক দেয়া হলো কেন? জাতিকে যখন বিএনপি-জামায়াত ও যুদ্ধাপরাধীদের হাত থেকে শক্তভাবে সামনের দিকে জননেত্রী নিয়ে যাচ্ছেন তখন কেন বই রচনাকারীরা এহেন অপরাধ করেছেন– তার জন্য এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করেনি। এনসিটিবি তার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তাদের ভাবখানা যেন মহাজনস্বরূপ। দুষ্ট লোক কানাঘুষা করে; কিন্তু একজন শিক্ষক হিসেবে ওই কানাঘুষায় কর্ণপাত করতে চাই না। উপরের দিকে থুতু ছিটালে যে নিজের গায়েও পড়ে। তবে আশ্চর্যের বিষয় শিক্ষামন্ত্রীর বেশকিছু তৎপরতা চোখে পড়লেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎপরতা চোখে পড়েনি। অবিলম্বে শূন্যপদে শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। হয়ত আত্মাভিমান হতে পারে– কিংবা উনার দায়িত্বের পরিধিটিও অন্য মন্ত্রণালয় গ্রাসে উদ্যত হতে পারে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শৈশবে সূচনা হয় মানসিক বিকাশ। আর আমাদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষাকে কিছু যশধারী শিক্ষক স্বীয় স্বার্থে বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। মধ্য বয়সে এসে বইগুলো পড়তে গিয়ে বারবার শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'র কথা মনে পড়েছে। না! এ সমস্ত শিক্ষককে সামাজিক কাঠগড়ায় দুটো কারণে দাঁড় করানো উচিত– শিশুদের বিকাশ সাধনে অন্তরায় সৃষ্টি ও জননেত্রীর মহান উদ্দেশ্য কল্যাণ ও সুন্দর শিক্ষাকে ধূলিসাৎ করা। গ্রন্থগুলো প্রকাশনে যে মন্ত্রণালয়ই আগে

P.T.O